# এক যে ছিল ডাইনি বুড়ি - ১

তরুণ প্রেমিকদের প্রতি আমাদের সবারই বোধহয় মনে মনে একটা দুর্বলতা আছে। বলতেই বলে সারা দুনিয়া প্রেমিকদের ভালবাসে। অন্য দিকে প্রেম না করেই বিয়ে, সম্বন্ধ করে বিয়ে, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে বরাবর একটা আপত্তির রেশ পোষণ করে এসেছি মনে মনে। ছাত্রজীবনে ইংল্যাণ্ডে বিদেশী পরিচিতেরা যখন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা রীতি-নীতি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতো, বিয়ের প্রসঙ্গটা সযত্নে এড়িয়ে যেতাম।

সব সময় অবশ্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। অন্তত একবার সম্ভব হয়নি। বন্ধু রোজমেরীর বাড়ি লাঞ্চের নিমন্ত্রণে গিয়ে কি রকম নাজেহাল অবস্থায় পড়েছিলাম মনে করলে এখনও লজ্জা ও রাগে দিশেহারা হয়ে যাই। লজ্জা সেদিনকার সেই অতি ভদ্র, ভীতু, লাজুক মেয়েটার অক্ষমতায় আর রাগ রোজমেরীর দাম্ভিক অর্ধশিক্ষিত দিদিমার উপর যিনি বিদেশী মুখচোরা মেয়েটিকে যত রাজ্যের আজেবাজে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে এক অলস দ্বিপ্রহরের মনোরঞ্জনের খোরাক সঞ্চয় করছিলেন।

রোজমেরীদের বাড়ি এর আগেও বার দুই গেছি। রোজমেরীই আগ্রহ করে নিয়ে গেছে। ওর বাবা মা অতি ভদ্র ও স্নেহশীল, আমার অন্য যে সব বন্ধুর বাড়ি যাতায়াত ছিল ঠিক তাদের বাবা-মা'র মত। রোজমেরীর দিদিমা যে কিছুদিনের জন্যে ওদের ওখানে এসেছেন সেকথা জানা ছিল না। রোজমেরী আমাকে ওদের বাড়িতে ডাকার সময় কথাটা জানায়নি, বোধহয় জানানো নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিল। অবশ্য খবরটা জানা থাকলেও আমি যেতাম কারণ, "সরি ভাই, তোমার দিদিমা এসেছেন, এসময় যাবো না" একথা বলা যায় না। তাছাড়া তখন তো জানিনা দিদিমাটি কি চীজ!

আগের দু'বারের মতই নানা রকম সুখাদ্যের সমারোহ ছিল লাঞ্চে। আমি আইসক্রীম ভালবাসি বলে আমার পছন্দমত আইসক্রীম - ভিতরে চীজ দেওয়া, সন্দেশের মত সুস্বাদু - আনিয়েছিলেন রোজমেরীর মা। কিন্তু খাবো কি, রোজমেরীর দিদিমা আমাকে এক মিনিট দম নিতে দিলে তো! সেই একটি প্রসঙ্গ

নিয়ে জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করে তুললেন আমায়। গোড়ার দিকে রোজমেরীর বাবা মা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, মহিলার কঠোর মতামতগুলোর রূঢ়তা নিজেদের হালকা মন্তব্য দিয়ে হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দিদিমা অপ্রতিহত গতিতে একাগ্রচিত্তে নিজের কর্মসূচিতে লেগে রইলেন এবং লাঞ্চের শেষে টেবিল ছেড়ে ওঠার আগে রায় দিলেন, "দু'টি সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক যুবতীর কানে সৃষ্টিকর্তার আদিমতম মন্তর আউড়ে (যাও তোমাদের সন্তান সন্ততি দিয়ে সংসার ভরে তোলো) তাদের বাসর শয্যায় ঠেলে দেওয়ার মত অশ্লীল প্রথা আর হয় না।"

সেদিন আর লাঞ্চের পর রোজমেরীর নিজস্ব কামরায় বসে দুই বন্ধু মিলে চুটিয়ে আড্ডা দিইনি। লাঞ্চের পরেই কাজের দোহাই দিয়ে চলে এসেছিলাম। রোজমেরী পরে আমায় বলেছিল ওর দিদিমাকে আত্মীয় স্বজনরা সবাই মনে মনে অপছন্দ করে। তবে তার মুখের উপর কেউ কিছু বলতে সাহস করে না কারণ প্রৌঢ়াকে ঘাঁটালে আরও কি যে চোখা চোখা বাণী তার মুখ দিয়ে বেরোবে তা খতিয়ে দেখার সাহস নেই কারো। তারাই মানে মানে পিছিয়ে আসে।

এর পর কয়েক দশক কেটে গেছে। অনেক কিছু দেখেছি, শিখেছি, বুঝেছি। আজ কোন কিছুকেই চট্ করে একটা বিশেষ শ্রেণীতে ফেলে তৎক্ষণাৎ 'ভাল' অথবা 'খারাপ' এর সীলমোহর ছেপে দিতে বাধে। আমার জানা অসংখ্য বিপরীত ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আমায় ডেকে বলে, "দাঁড়াও! ভাল করে চেয়ে দ্যাখো। একটু ভেবে নিয়ে রায় দিও।"

*********************

অক্সফোর্ডে থাকাকালে একটি নেপালী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। এখানে তার নাম দিলাম সরোজিনী। সরোজিনীর জীবন ভারি অদ্ভুত। অতি শৈশবে বিয়ে হয়েছিল। তদবধি শ্বশুরবাড়িতে বাস। প্রাইভেট টিউটর আসতেন পড়াতে। সরোজিনী ও তার স্বামী একসঙ্গে টিউটরের কাছে পড়াশুনো করতো। বালক স্বামী নানারকম দুষ্টুমি করে শাস্তি পেতো। কখনো তাকে মুরগী হতে হত, কখনো দেয়ালমুখো হয়ে কান ধরে ঘণ্টাভোর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো, কখনো বা চেয়ারের মত আধ বসা আধ দাঁড়ানো অবস্থায় টান টান হয়ে করুণ চোখে মাষ্টার মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে

থাকতো কতক্ষণে অব্যহতি পাবে। আর সরোজিনী তাই দেখে কষ্টে হাসি চেপে রাখতো।

দু'জনে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকলো। তারপর বিলেতে পাড়ি দিলো। স্বামী অশোক লণ্ডনে পড়ে, সরোজিনী অক্সফোর্ডে। প্রতি শনিবারে হয় অশোক আসে, নয় সরোজিনী যায়। রবিবার বিকেলে ফিরে আসে যে যার ডেরায়। রোজ সন্ধ্যেবেলা অশোকের ফোন আসে। দেশে তাদের দু'টি ছেলেমেয়ে আছে - ছ'বছরের মেয়ে ও চার বছরের ছেলে। ঠাকুরদা ঠাকুরমা'র কাছে বড় হচ্ছে তারা। তাঁরা নিয়মিত নাতি নাতনির খবর পাঠান, ফটো পাঠান। বাচ্চাদের আঁকা হিজিবিজি ছবি পাঠান। ক্যাসেটে তাদের কথাবার্তা রেকর্ড করে পাঠান।

সরোজিনীর ঘরসংসার ও বিবাহিত জীবনের গল্প শুনতে শুনতে মনে হত যেন রূপকথার রাজ্যে চলে গেছি। অথচ বাল-বিবাহ যে একটি কু-প্রথা, অতি বাজে জিনিস, এ কথা তো সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই জেনে এসেছি।

********************

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। প্রেমিকদের সম্বন্ধে আমাদের বোধহয় একটা সহজাত দুর্বলতা থাকে যা কিছুতেই যেতে চায় না। গেল বছর ভার্জিনিয়ায় আমার নাতির বেবীসিটার লুপে'র (ওর পুরো নাম গুয়াদেলুপে, সুবিধার জন্য লুপে বলেই ডাকি আমরা) ঘরে একটা ফটো দেখে বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। দুই যুবক যুবতী (কিশোর কিশোরীও বলা চলে) পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দু'জনের চোখে স্বপ্নের ঝিকিমিকি, ভালবাসার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত দুই আনন। ফটোর তলায় লেখা "কর্পাস ক্রিস্টি, ১৯৮০"।

লুপে ঘরে ছিল না। ওকে খুঁজতেই ওর ঘরে ঢুকেছিলাম। বউমা অ্যানমেরী আমার কর্তাকে নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছে। হাঁটুর জন্যে চলাফেরা করতে অসুবিধে বলে আমি আর গেলাম না। তাছাড়া বাড়িতে নাতির সঙ্গে সময় কাটানোটাই অনেক বেশী লোভনীয় আমার কাছে। ওরা চলে যেতেই সুমিতকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। খাইয়ে দাইয়ে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম চারপাশে বালিশ দিয়ে ঘিরে। সুমিতকে মাঝে মাঝে কিছুতেই ঘুম পাড়ানো যায় না। ওর মা আর বেবীসিটার দু'জনেই হিমসিম খেয়ে যায়। অথচ সেই প্রথম দিন

থেকে আমি ওর পিঠে হালকা চাপড় দিয়ে "সোনা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গি এলো দেশে" শুরু করতেই নাতিবাবু ঘুম ঘুম চোখে একবার একটুখানি কৃতার্থের হাসি হেসে নিয়েই দে-ঘুম দে-ঘুম। একেবারে ভোজবাজি যেন। তারপর থেকে দাদুভাইকে ঘুম পাড়ানো আমার কাজ। ওরা চেষ্টাও করে না।

আজকেও দাদুভাইকে ঘুম পাড়িয়ে আমি এটা সেটা করছিলাম। এখন ওর ওঠার সময় হয়েছে। লুপেকে ডেকে সাড়া পেলাম না। নীচের তলায় ফ্ল্যাটবাড়িতে একটা ঢ্যাঙ্গা মতন আধবুড়ো লোক থাকে। আধবুড়ো হয়তো নয় তবু গোটা পঁয়ত্রিশ বয়েস হবে। লক্ষ্য করেছি অ্যানমেরী বাড়ি না থাকলে লুপে নীচের ফ্ল্যাটে যাবার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে। যখন তখন লাপাত্তা হয়ে যায় আর অনেক ডাকাডাকির পর দেখি নীচের ফ্ল্যাট থেকে অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে আসছে। জানি এদেশের রীতি রেওয়াজ অনেক কিছুই অন্য রকম, তবু ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছিল না। এখন না হয় আমরা রয়েছি। অন্য সময় তো লুপের ভরসাতেই বাচ্চাকে রেখে অ্যানমেরী অফিস যায়, পার্ট টাইম চাকরি হলেও। বাচ্চাকে বাড়িতে একা ফেলে লুপে যদি নীচের ফ্ল্যাটে চলে যায় সেটা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে উটকো একটা লোকের ফ্ল্যাটে যাওয়া কিংবা লোকটাকে এখানে ডেকে আনা কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। কথাটা অ্যানমেরীকে ঠিক কি ভাবে বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

লুপেকে একদিন ফটোর পাত্র-পাত্রীর বিষয় প্রশ্ন করে জানলাম ওরা লুপের বাবা-মা। ১৯৮০ সালে তোলা ফটো, আজ থেকে বাইশ বছর আগে তোলা হয়েছে।

বললাম, "তোমার বাবা কর্পাস ক্রিস্টিতে থাকতো বুঝি?"

"না, বাবা অস্টিনে থাকতো। সেখানে এক দরজির দোকানে কাজ করতো।"

"বুঝেছি, তোমার মা কর্পাস ক্রিস্টির মেয়ে ----।"

"না, মা থাকতো মাটেহুয়ালায়, মেক্সিকোর প্রত্যন্ত এলাকায় ----।"

"কিন্তু ছবিটায় লেখা রয়েছে কর্পাস ক্রিস্টি ----" একটু বিভ্রান্ত হয়ে বললাম।

"ওটা বাবা-মা'র বিয়ের আগের ছবি। বাবা ছুটিতে মেক্সিকোয় মন্টেরে'তে বেড়াতে গেছিল। সেখান থেকে মাটেহুয়ালায় তার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। বাবার জ্যাঠামশায় পারিবারিক ব্যাপারে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমার বাবার সাবেক দেশ মেক্সিকো। বহু আত্মীয় পরিজন ওখানে আছে।

মাটেহুয়ালায় মাকে দেখেছিল বাবা। মা বাবার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল।"

সেদিন আর বেশী কথা হ'ল না। সুমিতের দেখাশোনা ছাড়া আরও দু'চারটে ছুটকো কাজ করতে হয় লুপেকে। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন তখন অদৃশ্য হয়ে যায়। নীচের ফ্ল্যাটে কি যে মধুর সন্ধান পেয়েছে কে জানে। অল্প বয়সী মেয়েটা আবার বিপদ বাধিয়ে না বসে।

লুপের চিন্তা ছাপিয়ে ওর বাবা-মা'র ব্যাপারটাই আমার মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগলো। সম্পূর্ণ অচেনা দু'টি ছেলে মেয়ে, সতেরো আঠারো বছরের বেশী হবে না, মেয়েটির বয়স হয়তো আরও কম। শুনেছি যুক্তরাষ্ট্রের এক একটা রাজ্যে বিয়ে ব্যাপারে এক এক রকম নিয়ম কানুন। টেক্সাসে বিয়ের ন্যুনতম বয়স কত কে জানে। ওরা আবার বয়েস ভাঁড়িয়ে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে বিয়ে করেনি তো? কিন্তু কি নৈসর্গিক প্রেম! রোমিও জুলিয়েট, লায়লা মজনুরা কবির কল্পকথা নয়, ধরাতলে সত্যি সত্যি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে?

আমাদের ভার্জিনিয়ার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আগামী রবিবারের ফ্লাইটে রওনা হ'ব। মাঝে আর ছ'দিন বাকি। অ্যানমেরী গোটা সপ্তাহটা ছুটি নিয়েছে আমাদের সঙ্গে কাটাবে বলে। ওর ইচ্ছে ছিল আমাদের নিয়ে একটু ঘুরবে, দু'চারটে দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে আনবে। হাঁটুর জন্যে আমার পক্ষে বেশী ঘোরাঘুরি মুস্কিল। যাবার ক'দিন আগে থেকে আরও সাবধানে থাকছি পাছে ব্যথা বেড়ে গিয়ে যাত্রাকালে সমস্যায় পড়তে হয়। অতএব বাড়িতে বসেই আমাদের নানারকম মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করলো অ্যানমেরী - লনে বসে বার-বে-কিউ, ভাল ভাল রেস্টুরেন্ট থেকে আনানো নানাদেশীয় রকমারি প্যাক্‌ড্‌ লাঞ্চ/ডিনার। পপকর্ন ও চীজ মাখানো টরটিয়া চিপস্‌ খেতে খেতে বাড়িতে বসে সিনেমা দেখা। আর যা আমার সবচেয়ে ভাল লাগতো তা হ'ল কফির পেল্লায় মগ হাতে নিয়ে অফুরন্ত গল্প। আমার স্বামী দিনের বেলাটায় লনে বসে রোদ পোয়াতেন, কখনো বা বই পড়তেন। আমি আর অ্যানমেরী চুটিয়ে আড্ডা দিতাম। কত যে গল্প শুনতাম ওর কাছে! ওর আত্মীয় পরিজন বন্ধুবর্গের জীবনের যা কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনা - আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক, যার ঘটেছে ঠেলা সামলাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে সে - আদ্যোপান্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করতো।

(একবার এক খবরের কাগজের এডিটরকে নালিশ জানালো কোনও পাঠক,

"কি মশাই, কেবলই খারাপ খবর ছাপেন কাগজে, ভাল কিছু ছাপতে পারেন না?"

এডিটর বললেন, "খবর মানেই খারাপ খবর। ভাল খবরগুলো স্রেফ বিজ্ঞাপন।")

ওর কাছে শোনা ঘটনা নিয়ে আমি গল্প লিখেছি অ্যানমেরী সে কথা জানতো। তাই খুব যত্নভরে ঘটনাগুলো বলতো আমায়। এছাড়া অ্যানমেরীর গুছিয়ে কথা বলার একটা ক্ষমতা ছিল যা সবার থাকে না।

লুপের বাবা-মা সম্বন্ধে আমি মনে মনে যে স্বপ্নময় ছবি এঁকেছিলাম, কল্পনার তুলি বুলিয়ে আদর্শ প্রেম কাহিনী রচনা করেছিলাম মনে মনে, অ্যানমেরী এক টানে ছিঁড়ে নস্যাৎ করে দিলো তা। ওদের নাকি প্রেম ট্রেম কিছুই ছিল না। প্রয়োজনবোধে - বলতে গেলে প্রাণের দায়ে - বিয়ে। এ ম্যারেজ অফ্ কনভিনিয়েন্স। পুরো ঘটনাটা এইরকম :

মাটেহুয়ালা মেক্সিকোর একটা ছোট মফস্বল শহর। শহরের এক প্রান্তে একটা সাদামাটা বাড়ি। একটানা খানচারেক ঘর, সামনে এক ফালি সরু বারান্দা। প্রথম ঘরটায় ইট সিমেন্টের পাকা দেয়াল, পাকা ছাদ, নতুন পেন্ট করা কাঠের দরজা জানলা। বাকি ঘরগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা। খাপড়ার চালাঘরের কিছু কিছু খাপড়া নিরুদ্দেশ। বৃষ্টি বাদলার দিনে ঘরে বসেই ভিজে ঝাপুস হয়ে যায় বাসিন্দারা। ছোপ ধরা দেয়ালের জায়গায় জায়গায় চুনবালি খসে আসছে, বারান্দায় যেখানে সেখানে ফাটল ও গর্ত।

বাড়ির বারোমেসে বাসিন্দা কতিপয় বালক বালিকা। তাদের মা ম্যানুয়েলা এসপিনোজা কদাচিৎ এ বাড়িতে বাস করে। সামনের ঝকঝকে তকতকে পাকা ঘরখানা তার। ম্যানুয়েলা ডাকসাইটে 'ভুডু' বিশারদ - নানা রকম ঝাড়ফুঁক মন্ত্র তন্ত্রে সিদ্ধহস্ত। বেশ ভালই পসার আছে তার। দূর দূরান্ত থেকে মক্কেলদের ডাক আসে। তারা নানাবিধ যন্ত্র তাবিজ, ওষুধ পট্টি বানিয়ে নেয় ম্যানুয়েলার কাছ থেকে, গোপন পরামর্শ নেয় পারিবারিক ও বৈষয়িক বিষয়ে। তবে নিকটবর্তী বাসিন্দাদের নজর বাঁচিয়ে আড়াল আবডাল থেকে কাজ চালিয়ে যেতে চায় ম্যানুয়েলা। তার প্রতি স্থানীয় লোকেদের বিরূপ মনোভাব তার অজানা নয়।

ম্যানুয়েলার পাঁচটি সন্তানের মধ্যে প্রথম দু'টি কন্যা - তেরো বছরের মারিয়া ও

বারো বছরের মেলা। এরপর তিনটি পুত্র সন্তান - রিকার্দো আট, পেপে ছয় ও রবার্তো তিন। নিন্দুকেরা বলে ম্যানুয়েলার নাকি আরও গোটা কয়েক - অন্ততপক্ষে আরও তিনটে - এঁড়ি গেঁড়ি থাকার কথা। তারা নেই, কারণ ঝাড়ফুঁক জড়িবুটি দিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'বার আগেই তাদের হাপিস করে দিয়েছে ম্যানুয়েলা।

সারা বছরে বেশ কয়েকবার 'কল'এ যায় ম্যানুয়েলা দলবল নিয়ে। দলবল মানে তার শাগরেদ এবং সহায়ক 'ভুডু' কর্মী যারা। বাড়ি থেকে ম্যানুয়েলা একা বেরোয়। ছেলেমেয়েরা এখানেই পড়ে থাকে। এমনকি তাদের দেখাশোনা খাওয়া-দাওয়া কোন কিছুর ব্যবস্থা করে যায় না সে। খদ্দেরের ডাক এলেই হুট করে বেরিয়ে পড়ে নিজের ঘরখানায় তালা এঁটে। অবশ্য একেবারে হুট করে নয়। 'ভুডু' বিশারদের যথাযোগ্য সাজগোজ করে, নিজের পোর্টমেন্টো ব্যাগ ও বাহারে ঝুড়িখানা গুছিয়ে নিয়ে, মাথার টুপির সবক'টা পালক ঠিক ঠিক ভাবে গুঁজে রাতের অন্ধকারে নিঃসাড়ে মিলিয়ে যায়।

ম্যানুয়েলা 'কল'এ গেলে কবে ফিরে আসবে তার কোনও ঠিক থাকে না। অনেক সময় হপ্তা, দু'হপ্তা পেরিয়ে যায়। নিন্দুকেরা বলে মক্কেলের কাজ সেরে প্রাপ্য টাকাটা পুরোপুরি নিঃশেষ করে তবেই বাড়িমুখো হয় ম্যানুয়েলা। ম্যানুয়েলার চেলা-চামুণ্ডার সংখ্যা কম নয়। তবে এ তল্লাটে তারা বড় একটা আসে না। লোক দিয়ে ম্যানুয়েলা তাদের এত্তেলা পাঠায় কবে কোথায় যেতে হবে। একটা নির্দিষ্ট স্থানে ম্যানুয়েলার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে তারা, মাটেহুয়েলার সীমানার বাইরে। তারপর সবাই মিলিত হয়ে অকুস্থল অভিমুখে যাত্রা করে। 'ভুডু' ব্যাপারটা অনেকটাই দর্শনধারী। তার উপচার সাজসরঞ্জামের পরিমাণ কম নয়।

ম্যানুয়েলা রওনা দিলেই আশেপাশের স্বার্থান্বেষী লোকেরা এক এক করে এসে উদয় হয়। ম্যানুয়েলার যত পাওনাদারেরা এসে জোটে। মুদি, রুটিওলা, মাংসওলা সবারই নাকি ম্যানুয়েলার কাছে টাকা বাকি পড়ে আছে। ম্যানুয়েলার বিরাট ব্যক্তিত্ব। খান আষ্টেক পালক গোঁজা টুপিসুদ্ধু মাথা ঝাঁকিয়ে কোমরে দু'হাত রেখে যখন উচ্চ গ্রামে গলা চড়িয়ে কথা বলে, চোখা চোখা বাক্য আওড়ায়, প্রতিপক্ষ পালাবার পথ পায় না। এখন তাই ম্যানুয়েলার অনুপস্থিতিতে তারা চুটিয়ে নালিশের খাতা উজাড় করে। মারিয়া আর মেলা কি করবে ভেবে পায় না। মেলা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। মারিয়া পালাতে পারে

না। মারিয়া ঘরে ঢুকে পড়লে পাওনাদাররাও ওর পিছন পিছন ঘরের মধ্যে চলে আসে। আর তারপর ওর অপরিণত কচি দেহটাকে নিয়ে এমন সব কাজ করে যা মারিয়ার একটুও ভাল লাগে না। তার কষ্ট হয়, কান্না পায়। তাই পাওনাদার এলে মারিয়া ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসে, বারান্দা থেকে নেমে আসে সামনের বারোয়ারী পোড়ো জমিটায়। অন্তত কিছুটা নিরাপত্তা আছে সেখানে।

এইভাবে দু'টো বছর কেটে গেছে। মারিয়া এখন ষোলোয় পা দেবে। মেলা পনেরোয়। ম্যানুয়েলা এসপিনোজা এবার লম্বা পাড়ি দিয়েছে ঝাড়ফুঁকের সাজ সরঞ্জাম আর তার 'ভুডু' বাহিনীকে নিয়ে। দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। বাড়িতে চাল, আটা, মকাই, আলু, কিচ্ছুটি নেই আর। তেল নেই, জ্বালানি কাঠ নেই, জামাকাপড় কাচার সাবান নেই। মুদি ফার্নান্দো রোজই একবার আসে। মারিয়াকে তার মুদিখানা থেকে প্রয়োজনমত খাবারদাবার জিনিসপাতি আনার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে যায়। মারিয়া রিকার্দোকে পাঠিয়েছিল এক প্যাকেট পাস্তা আনতে। তাকে গালাগাল দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে মুদি। শুধু মারিয়ার হাতেই 'মুফতে' মাল দেবে সে। অন্য কেউ এলে যেন নগদ টাকা সঙ্গে আনে। মারিয়া যেতে চায় না। সে জানে মুদির বদ মতলবখানা। তাকে দোকানঘরের পিছনে নিয়ে গিয়ে কি সব করেছিল লোকটা। তারপর আর যায়নি মারিয়া। পুরো দু'টো দিন কেটে গেছে। বাড়িতে আর কোনও খাবার বাকি নেই। একটি দানাও না। ভাইগুলো খিদেয় কাঁদাকাটি করছে। মারিয়া শুকনো মুখে বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

একটু দূরে অল্পবয়সী একটি ছেলে - আঠারো উনিশ বয়স হবে - মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে মারিয়াকে লক্ষ্য করছিল। এবার ওর দিকে এগিয়ে এলো।

'তোমার নাম কি?'

'মারিয়া। মারিয়া এসপিনোজা।'

'কাঁদছিলে কেন?'

মারিয়া কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। 'আমি এই নরকে আর একদণ্ড থাকতে চাই না। এর থেকে মরে যাওয়া ভাল। আমি মরতে চাই।'

ছেলেটি মারিয়ার একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিলো। 'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। আমার নাম হোসে বারেরা। আমি আজই অস্টিন-এ ফিরে যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারো। সেখানে কেউ তোমার হদিস পাবে না।'

মারিয়া ঘর থেকে জুতো জোড়া পরে এলো।

মেলা বললো, 'কোথায় যাচ্ছিস? মুদিখানায়?'

মারিয়া কোনও জবাব দিলো না। ভাইগুলো খাবার জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করছিল।

মেলা ওদের আশ্বাস দিয়ে বললো, 'একটু সবুর কর। মারিয়া মুদির কাছে যাচ্ছে। এক্ষুণি খাবার নিয়ে আসবে। মারিয়া এলেই আমরা খেতে বসবো।'

মারিয়া আর কোনদিন ফিরে আসেনি।